শতবর্ষের তর্পণ

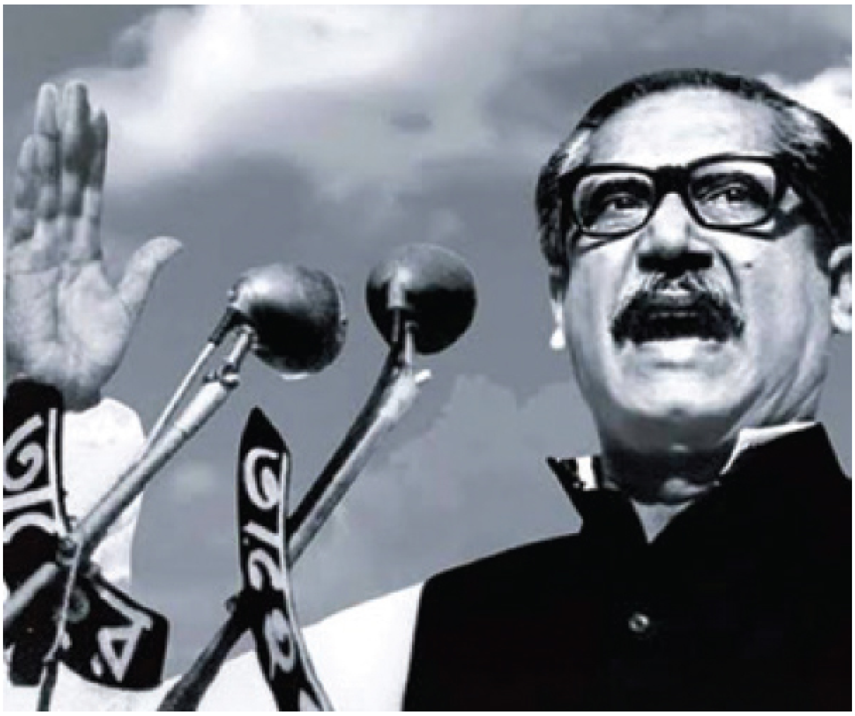

January 18, 2020 0 Comments

জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি

অমর মিত্র

মুক্তিযুদ্ধের আগে সীমান্তের ওপার ছিল আমার কাছে এক অলীক ভূখণ্ড। আমাদের ফেলে আসা গ্রাম, নদী আর আমাদের নেই, মায়ের কাছে এই কথা শুনে আমি তাঁর দুঃখ আর কান্নাকেই যেন ধারণ করেছিলাম উত্তরাধিকার সূত্রে। পূর্ব পাকিস্তান, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, ভারত-পাকিস্তানের সেই ১৯৬৫-র যুদ্ধ, ব্ল্যাকআউট, প্যাটন ট্যাঙ্ক, মিগ বিমান, স্যাবার জেট – এসব দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। পূর্ব বাংলার কোনো খোঁজ তেমন পেতাম না। ভিনদেশ ভিনদেশই হয়ে ছিল। শত শত যোজন দূর যেন, শুধু আমার মা রেডিও পাকিস্তান শুনতেন, তখন শোনা যেত মনে হয়। মা খবর দিতেন সাতক্ষীরাতে কী হলো, কপোতাক্ষ নদে কোথায় ব্রিজ হলো। এসব সংবাদই ছিল তাঁর কাছে আশ্রয়। এসব সংবাদ কবিতার সুষমায় ভরা থাকত তাঁর কাছে। মুক্তিযুদ্ধই আমাকে প্রথম জানাল বাঙালি যুদ্ধে নেমেছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। যাদের নিয়ে তারা আলাদা হয়েছিল, কিংবা হাঁড়ি ভিন্ন হয়েছিল, হাঁড়ি আলাদা করা হয়েছিল,

তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। আর তার নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পর এক দেশনেতা, সব অর্থে বাঙালি, যিনি বলতে পেরেছিলেন,'আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। নেতাজির সেই ডাক, 'আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' – তা যেন ভাষার জাদুতে অন্য রকমে আমাদের কাছে নিয়ে এলেন শেখ সাহেব। সেই যে ৭ই মার্চের ডাক, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল', 'ভায়েরা আমার, সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' – মনে হয়েছিল শৌলমারীর সাধু নন, নেতাজি ফিরেছেন শেখ মুজিব হয়ে। শৌলমারীর সাধুর কথা ওপারের মানুষ জানেন কি না বলতে পারি না। আমাদের বাল্যকালে সংবাদপত্রে শৌলমারীর এক সাধু নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছিল। প্রায়ই সংবাদপত্রের বিশেষ বৈকালিক সংস্করণ (টেলিগ্রাম) বেরোত 'নেতাজি ফিরে এলেন' এই শিরোনাম নিয়ে। সেই টেলিগ্রাম মুহূর্তে শেষ। গত শতকের ছয়ের দশকের প্রথম ভাগে মানুষ বিশ্বাস করত নেতাজি ফিরে আসবেন এবং বাঙালির সমস্ত দুর্গতির অবসান ঘটাবেন। নেতাজি ফিরেছেন, এবং তিনি কোনো এক শৌলমারীতে সাধুবেশে আছেন, সময়েই আত্মপ্রকাশ করবেন। শৌলমারীর সাধু কি নেতাজি এই নামের একটি গ্রন্থ হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। পরে ধীরে ধীরে এই সংবাদের অবসান ঘটে। কিন্তু শেখ মুজিবের ডাক শুনে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনে সদ্য যুবা এই অমরের মনে হয়েছিল, সুভাষ ঘরে ফিরেছেন। সময়ে ফিরেছেন। ওপারে বাঙালি দলিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে, সুভাষ ঘরে ফিরেছেন। খবর আসছে সীমান্তের ওপার থেকে।

মুক্তিযুদ্ধের আঁচ আমরা পেলাম। সমস্ত পৃথিবী পেল। খবর পেলাম শেখ মুজিবের ডাকে বাঙালি যুদ্ধে নেমেছে। রক্ত দিচ্ছে বাঙালি। বাঙালিকে ১৯৪৭-এর পর থেকে মারছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। বাঙালি এবার রুখে দাঁড়িয়েছে। মিথ্যে হয়ে গেছে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ। মুক্তিযুদ্ধের সময় চারপাশে অবাঙালি অধ্যুষিত কলকাতা শহরে বড় হয়ে ওঠা আমি নিজে জানলাম বুঝি সকলের আগে আমি বাঙালি। বাংলা ভাষা আমার ভাষা। এই ভাষা রক্ষার দাবিতেই পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। উদ্বাস্তু আসছে হাজারে হাজারে। তাদের জন্য সল্টলেক বালির মাঠে শিবির করা হয়েছে। তখন ওই নগর গড়ে ওঠেনি। ভেড়ি বুজিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে ধু-ধু বালির মাঠ। যাই হোক, তখন অ্যালেন গিন্সবার্গ কবিতা লিখছেন যশোর রোডের ধারে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তু পরিবার নিয়ে, জর্জ হ্যারিসন-রবিশঙ্কর কনসার্ট করছেন বাংলাদেশের সমর্থনে। হুমড়ি খেয়ে *আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, অমৃতবাজার* পত্রিকা পড়ছি। বাংলাদেশ বাংলাদেশ …

My friend came to me

With sadness in his eyes

Told me that he wanted help

Before his country dies

Although I couldn't feel the pain

I knew I had to try

Now I'm asking all of you

Help us save some lives

Bangla Desh, Bangla Desh

Where so many people are dying fast

And it sure looks like a mess

I've never seen such distress

Now won't you lend your hand

Try to understand

Relieve the people of Bangla Desh

Bangla Desh, Bangla Desh

আমি কি এই আর্ত বাঙালির কেউ নই? খবরের কাগজ আর রেডিও আমাকে বদলে দিতে লাগল।রেডিও কত মধুর তখন। আমি উনিশ পেরিয়ে কুড়ি, তখন একদিন একটি খবর বেরিয়েছিল, বরুণ সেনগুপ্ত সাতক্ষীরা গিয়ে ফিরে এসেছেন। সাতক্ষীরাতে যে আমাদের বাড়ি। তা অলীক ভূখণ্ড নয়।খুব কাছে। বসিরহাট পেরোলেই, ঘোজাডাঙা বর্ডার দিয়ে একটুখানি। সেখানে তাহলে যাওয়া যায়। সেই ভূখণ্ড অলীক নয়। সীমান্ত দূরে ঠেলে দেয় এক-এক ভূখণ্ডকে। যোজন যোজন দূর হয়ে যায় পাশের গ্রাম, পাশের গঞ্জ। তাই-ই ভাবতাম কতদূর সেই সাতক্ষীরা, কপোতাক্ষ আর মায়ের কাছে শোনা ময়মনসিংহ, যমুনা, টাঙ্গাইল, কালিহাতি, নেত্রকোনা, গারো পাহাড়। যোজন যোজন দূর। কোনোদিন তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হ্যাঁ, সত্যিই মনে হয়েছিল শেখ মুজিবই নিরুদ্দিষ্ট নেতাজি সুভাষ। তিনিই। না হলে এমন ডাক কে দেবেন? এমন অসাধ্য কে সাধন করবেন? আর আমার মনে হতে লাগল, শেখ মুজিব ডাক দিয়েছেন, আমাকে যেতে হবে যুদ্ধে। শেখ মুজিবকে ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারি গ্রেফতার করে দূর পশ্চিমে করাচি নিয়ে যায়; কিন্তু তিনি যে-ডাক দিয়ে গেছেন, তা সীমান্তের অলীক প্রাচীর ভেদ করে এপারে এসে পৌঁছেছে। মার্চ মাসের শেষ, পূর্ব পাকিস্তানের খাল-

বিলে আশ্রয় নেওয়া পরিযায়ী বুনো হাঁসের দল ফিরছে নিজ দেশে, সাইবেরিয়ার দিকে, তারা রাতের আকাশে উড়তে উড়তে খবর দিয়ে যাচ্ছিল, জয় বাংলা, বাংলার জয় ..., বুনো হাঁসের ডাক শুনেছিলাম এক গভীর রাতে। পূর্ব বাংলা থেকে, হাওর-বাঁওড়ের দেশ থেকে তারা খবর নিয়ে ফিরছিল, যুদ্ধ লেগেছে যুদ্ধ, মানুষের মুক্তির যুদ্ধ, শেখ মুজিবকে নিয়ে গেছে তারা অনেক দূরে, বন্দি করে রেখেছে এক গুহার ভেতর। তাঁর নামে জেগেছে মানুষ, খাল-বিল, নদী-নালা, গাছ-গাছালি নিয়ে মানুষজন।

শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি

আকাশে বাতাসে ওঠে রণি,

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ ...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরকে নিয়ে গান বেঁধেছেন অংশুমান রায়, গেয়েছেনও তিনি। রেডিওতে সেই গান শুনে আমি শিহরিত। আমার ভেতরে মুক্তিযুদ্ধ প্রবেশ করছে। আমি ভারতীয়; কিন্তু বাঙালি। বাঙালির জাতিসত্তা প্রোথিত হয়ে যাচ্ছে আমার ভেতর। শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানিরা নিয়ে গেছে পশ্চিমে। আমি মনে মনে নিজেই লক্ষ মুজিবরের একজন হয়ে উঠেছি। ঘুমের ঘোরে কী বলছি কে জানে, মা ডাকছেন, কী বলছিস? ... এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

মনে পড়ে তখন আমার এই শহর কলকাতা উত্তাল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ি, দুপুরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে মিটিং। মিছিল। কলেজে কী অপূর্ব বক্তৃতা শুনলাম কবি, অধ্যাপক তরুণ সান্যালের। একটি ঘণ্টা তিনি বলেছিলেন, নাকি তারও বেশি, শেখ মুজিবের জন্য যেমন ছিল উৎকণ্ঠা, তেমনি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সমর্থন। মুক্তিযুদ্ধ ছিল যেন শেষ যুদ্ধ। শেখ মুজিব ডাক দিয়েছেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। বছর কুড়ির আমি করব কী? ফুটছি, শুধু ফুটছি। রেডিওতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদ পাঠ শুনছি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে কথিকা শুনছি। তখন রেডিও আর সংবাদপত্রই ছিল জানার একমাত্র উপায়।

আমি কয়েকজনকে জোগাড় করে চাঁদা তুলতে বেরোলাম পাড়ায়। অবাঙালিরা মুখ ফেরালেন কিছু কিছু, আবার দিলেন যে কেউ কেউ তাও মিথ্যে নয়। বাঙালিরা সবাই যে দিলেন তা নয়, অনেকে দিলেন, অনেকে দিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, কী করব আমরা? আমরা কি মুক্তিযুদ্ধে যাব? অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন আমাদের। নীলু, কালু, লালু, বংশীদের নিয়ে চাঁদা তুলতে আসা নিরীহ ছেলেটিকে। নীলু, কালুদের বাড়ি বেলগাছিয়ার বস্তিতে। বাবা কলমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি। উদ্দীপ্ত নীলু বলল, হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধে যাব।

বাঙালির মহাযুদ্ধ ওপারে যে শুরু হয়েছে এই কথা বলতে লাগলাম পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর অংশুমান রায় তখন এপারের বাঙালিকে উদ্দীপ্ত করছেন। আমি বাঙালি আগে। আমাদের ফেলে আসা মাতৃভূমি আক্রান্ত। মাতৃভূমির কোনো খোঁজই রাখতাম না। কিন্তু এখন চিনলাম। চিনিয়েছেন শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু। যুদ্ধ চলছে। আমি চাঁদা তুলতে লাগলাম। হ্যাঁ, এ-ও সত্য, আমার সহপাঠী বন্ধুরা, পাড়ার ভদ্রলোক পরিবারের বন্ধুরা কেউ তেমন এলো না, যারা আমার সঙ্গী হলো, সেই সব গরিব বস্তিবাসীর সন্তান, নীলু, কালু, বংশী, লালু, পল্টুরা বলল, চলো আমরাও যাব যুদ্ধ করতে। কেউ কেউ বলল, পেটো বোমা বানিয়ে নিয়ে যাবে কি না। তারা ভেবেছিল পেটো বোমা দিয়ে খানসেনা মারবে। আমিও কি তা ভাবিনি? আমি নেতা, হ্যাঁ বললেই সোরা, গন্ধক, লোহাচুর ইত্যাদি মাল-মশলা তারা কিনে আনবে, বাড়িতে বসে সুতলি দড়ি দিয়ে বোমা বেঁধে সীমান্তে যাবে, দিয়ে আসবে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। না, তা হয় না। যদিও সেই ’৭১-এর কলকাতায় পেটো বোমা প্রায় কুটিরশিল্প। তবুও ‘না’ বললাম, আগের বছর বোমা বাঁধতে গিয়ে এই এলাকার দাপুটে মস্তান লখিয়া মারা গেছে বিস্ফোরণে। আবেগপ্রবণ আমি তো আসলে ভীতু, সেই ভয় থেকে বললাম, না, পেটো বোমা দিয়ে যুদ্ধ হয় না। বরং ফার্স্ট এইড নিয়ে যাই। এই পরামর্শ পাড়ার সংগীতশিল্পী গোপালদা দিলেন। তিনি গুনগুন করছেন অংশুমান রায়ের গান। তিনি গলা ছেড়ে গাইছেন, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ...। তিনি গাইছেন, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি ...। গোপালদা যা বলছেন তাই হলো। সেই টাকায় প্রাথমিক শুশ্রূষার ওষুধ, ডেটল, বেঞ্জিন, তুলো, ব্যান্ডেজ, আর কী কী কেনা হলো। বনগাঁ লোকাল ধরে বনগাঁ চললাম। উদ্দেশ্য হরিদাসপুর সীমান্ত, সীমান্তের ওপার দিয়ে যশোর যেতে হয়, যশোরে আমার কাকিমার বাপের বাড়ি, ছোটবেলা থেকে তাই শুনে আসছি। আর মা বললেন, যশোরের আগে নাভারণ বলে একটা জায়গা আছে, সেখান দিয়ে সাতক্ষীরা যাওয়া যায়। মা আরো বললেন, যশোরের কাছেই সাগরদাঁড়ি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি ..., সেই মহাযাত্রার আগের রাতে মা আমাকে এসব বললেন। আর বললেন, সাবধানে যাবি। মা আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন।

দমদম জংশন স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলাম জনাছয় যুবক। ট্রেন চলতে লাগল, পার হতে লাগল বারাসাত, অশোকনগর, মসলন্দপুর, হাবড়া, গুমো, গাইঘাটা, ঠাকুরনগর ... ট্রেন ভর্তি হয়ে যেতে লাগল। জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে উঠতে লাগল যুবক আর মধ্যবয়সীরা। তাঁদের গায়ে যেন ওপারে ফেলে আসা খাল-বিল, জন্মভূমির কাদামাটির গন্ধ। সবাই যাচ্ছেন সীমান্তে। পাকিস্তান আর থাকবে না। বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে এসেছেন একজন। বনগাঁ থেকে সেই পতাকা কাঁধে মিছিল চলল সীমান্ত পর্যন্ত। শেখ মুজিবের ডাকে আমরা চলেছি যেন যুদ্ধে। সীমান্তের চেকপোস্টে আটকেছে সীমান্ত প্রহরীরা। কিন্তু তারাই পথ দেখিয়ে দিলো, কোন দিক দিয়ে ‘জয় বাংলা’য় ঢুকতে হবে। বাংলাদেশের নাম তখন জয় বাংলা। আমাদের এবার লুকিয়ে যাওয়া। কোন গ্রাম, খাল-বিল পেরিয়ে সীমান্তের ওপারে এক মুক্তিশিবিরে পৌঁছলাম যখন বেলা দুপুর। জয় বাংলা ডাক দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মধ্যবয়সী একজন। তাঁকে আমার স্পষ্ট মনে আছে, লুঙ্গি আর গেঞ্জি, হাতে বন্দুক। শেখ মুজিবের ডাকে এসেছি। জয় বাংলা। যা দেওয়ার দিয়ে ফিরে এসেছিলাম, কেননা শুনছিলাম পাকবাহিনী যশোরেরও এপারে ঝিনাইদহে এসে গেছে। এদিকে আসছে তারা। একটু মাটি নিয়ে ফিরেছিলাম। মাটি দেখে মা আর বাবার চোখে জল। কতকাল বাদে মনে পড়ল সেই ফেলে আসা গ্রাম আর নদীর কথা। বাড়ির সকলে জিজ্ঞেস করতে লাগল সীমান্তের ওপারের কথা। আমি যেন দেখে এসেছি বাড়ির পিছনের কাঁঠালগাছটি। আমি যেন দেখে এসেছি চুষির আমগাছটি। আমি যেন কথা কয়ে এসেছি, এজার শানা, মোজার শানার সঙ্গে। তাঁরা ছিলেন বাবার বন্ধু। সেই মাটিকে মা তাঁর বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি ধুরোল গ্রামের মাটি বলে লক্ষ্মীর পটের পাশে রেখে দিলো।

কলকাতার যে-অঞ্চলে বাস করি, আমাদের প্রতিবেশী পাহাড়প্রমাণ লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়ে এসে ১লা বৈশাখে এক সভা করলাম পার্কে। লোক ভেঙে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ পাঠ হলো। শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি তোলা হলো। কতবার যে আমরা জয় বাংলা বললাম। পিতৃপুরুষের মতো লেখক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন মিনিট ৪৫ কিংবা এক ঘণ্টা। আমরা বাঙালি। আমাদের ভাই, বন্ধু, আত্মজ যুদ্ধে নেমেছে। মুক্তির

জন্য এই যুদ্ধ। এ-যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধও। মুজিবুর আমাদের প্রাণের মানুষ। মুজিবুরের ডাক আমরাও শুনেছি যে, কারণ আমাদের ভাষা বাংলা। আহা সেই পয়লা বৈশাখের কথা এখনো মনে পড়ে। বীরভূমের সন্তান, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বক্তৃতা লিখে রাখিনি, তখন রেকর্ড করার ব্যবস্থাও ছিল না। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলেছিলেন, ঋজু মানুষ, সটান দাঁড়িয়ে আছেন মঞ্চে। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি। মুগ্ধ হয়ে শুনছে সমস্ত পাড়া। না, তিনি দেখে যেতে পারেননি বাঙালির মুক্তি, বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসা। ওই বছরের ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন। তখনো যুদ্ধ চলছে, বাংলাদেশের খালে-বিলে, মাঠে-প্রান্তরে, গাঙে, গাঙপাড়ে যুদ্ধ চলছিল তখন। মানুষ মরছিল। মানুষ সীমান্ত পার হয়ে যশোর রোডের ধারে ঝুপড়ির বাসিন্দা হয়েছিল। সেই মানুষ নিয়েই তো গিন্সবার্গের কবিতা।

তারপর? যুদ্ধ চলল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত পেরিয়ে শীতে মুক্ত হলো এই দেশ। নতুন দেশের জন্ম হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর যে-ডাক দিয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল বাংলাদেশের মানুষ, মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধই জন্ম দিয়েছিল বাংলা নামের একটি দেশের। ভারত পাশে দাঁড়িয়েছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সব মিলিয়ে বাঙালির নিজস্ব একটা দেশ হলো। অনেক পরাজয়ের পর বাঙালি জিতল সেই প্রথম। তার আগের ইতিহাস তো শুধু পিছু হটার। বঙ্গবন্ধুর ডাকে যে-জয় তা এক নতুন দেশের জন্ম দিলো। মহৎ মহৎ মহৎ। সেই জয় যা কি না এমন একটা দেশের জন্ম দিলো যে-দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সরকার চিঠি দেয় বাংলায়। মানুষ বাংলায় চিঠি লেখে প্রধানমন্ত্রীকে। সরকারি অফিসে গিয়ে বাংলায় কথা বলতে পারে সাধারণ মানুষ, প্রান্তিক মানুষ। বাংলা জানলে কাজ হয়। সর্বত্র বাংলা বাংলা আর বাংলা। আর এই ভাষা, এই ভাষার গান, এই দেশের সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস সব নিয়ে দেশটা বিপুল হয়ে উঠল ক্রমশ। আমাদের এই পারে এই অভ্যাস থেকে আমরা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলাম। এখন তো বাঙালির খাদ্যেই থাবা বসিয়েছে শাসকের খবরদারি। মছলিখোর অপবাদটি আমরা সহ্য করে মাছের ঝোলেই ভাত মাখি। একটা জাতি যা নিয়ে বিশিষ্ট হয়, তাকে সবসময় রক্ষা করা এই ভুবনায়নের দিনে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভুবনায়নের কথা তো আজকের কথা, ১৯৫৫ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদে শেখ মুজিব এই কথা বলেছিলেন –

স্যার [গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট], আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, পাকিস্তানের পরিবর্তে আপনাদের বাংলা [বঙ্গ] ব্যবহার করতে হবে। 'বাংলা' শব্দটার একটি নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য আছে। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কিনা।

তিনি আরম্ভেই বাংলার কথা বলেন। জাতির আত্মপরিচয়ের কথা বলেন। '৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারির পর এই ভাষণই যেন ১৬ বছর পরের বাংলা নামে দেশটির জন্মের সূচনা হয়ে দাঁড়ায়। বাঙালি, বাংলা ভাষা, বাঙালির জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল তাঁর রক্তের অন্তর্গত। সেই স্বপ্ন নিয়েই বাংলাদেশের জন্ম। স্বপ্ন একদিনে পূরণ হয় না। ক্রমাগত পূরণ করে যেতে হয়। বাংলাদেশে তা হচ্ছে কি হচ্ছে না জানি না, কিন্তু নবান্ন, ঘরে ঘরে পিঠেপুলির উৎসব, এক মাস একুশের বইমেলা, ১লা ফাল্গুন রঙের উৎসব, ১লা বৈশাখ নববর্ষ উদযাপন বাংলা মায়ের ছবির পিছনে যেন আলোক বলয় সৃষ্টি করে যাচ্ছে অবিরত। লৌকিক যে-জীবনকে বাঁচিয়ে তোলার কাজটি বাংলাদেশে হচ্ছে নানাভাবে, তা নিয়েই বাঙালি আর পাঁচটি জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা ছিল। একটা জাতি তার ভাষা আর সংস্কৃতিকে যেভাবে রক্ষা করছে নানা প্রতিকূলতার ভেতরে তা দেখে আমার মনে হয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ চলছে। শেখ মুজিবুর রহমান আছেন বাংলাদেশের হৃদয়ে। আলোয় বাতাসে। বাঙালি তার জাতিসত্তা নিয়ে বিকশিত হচ্ছে। একটা ফুল ফুটছে আর ফুটছে। পাখি ডানা মেলছে আর মেলছে। এই ফুটে ওঠা আর মেলে দেওয়ার শেষ নেই। জাতি হিসেবে আমি এই বাঙালির একজন, আমার দেশ অন্য দেশ হলেও আমি আমার আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছি সেই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি থেকে। বঙ্গবন্ধুর কাছে তাই সবসময় প্রণত। মনে হয় নেতাজি সুভাষের অসমাপ্ত কাজ তিনিই সমাপ্ত করেছেন। আমাদের শহরে ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এসেছিলেন। দিনটি ৬ই ফেব্রুয়ারি। সদ্য পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত নিজ দেশে ফিরেছিলেন। দেশ তখন স্বাধীন। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সেই সভা হয়েছিল। জমায়েত লক্ষ লক্ষ এদেশের মানুষ। সমস্ত কলকাতা আর শহরতলি মাঠে গিয়ে হাজির হয়েছিল। কলকাতা সমস্বরে উচ্চারণ করেছিল, 'জয় বাংলা'। আমিও গিয়েছিলাম। তাঁকে দেখতে পাইনি। কাতারে কাতারে মানুষ গেছে

সেই মিটিংয়ে। কী করে দেখব আমার স্বপ্নের নায়ককে। আবছা আবছা দেখছি সব। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে নেতাজি ফিরে এসেছেন শেখ মুজিব হয়ে। লাউড স্পিকারে তাঁর বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম।১৯৭১-এর ৭ই মার্চের কথা শুনেছি, তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা, বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয়া শেখ হাসিনার লেখা পড়েছি *দেশ* পত্রিকায়, এই সেদিন, গেল ১৭ই মার্চ, পড়ে মনে হয়েছিল, তিনি যেন আমাদের গড়ের মাঠের কথাই লিখেছেন, যে-মিটিংয়ে গিয়ে আমি শীতের বেলার আবছা কুয়াশার ভেতরে বুঝি দেখেছিলাম মস্ত এক পাহাড় দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছেন, 'জয় বাংলা'। 'আমার ভাইয়েরা'শিরোনামে মাননীয়া শেখ হাসিনার লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে, আমিও যেন রেসকোর্স ময়দানে ছিলাম সেদিন ...,

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, শ্রদ্ধেয়া শেখ হাসিনা লিখছেন,

রেসকোর্স ময়দান। সকাল থেকেই দলে দলে লোক ছুটছে ময়দানের দিকে। গ্রামবাংলা থেকে মানুষ রওনা দিয়েছে ঢাকার পথে। সকাল দশটা-এগারোটার মধ্যেই আমরা শুনতে পারলাম, ময়দানে লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। একটা মঞ্চ তৈরি হচ্ছে, খুবই সাদাসিধে মঞ্চ। মাথার উপর কোনো চাঁদোয়া নাই, শুধু একটা খোলা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে মুখ করে মঞ্চটা তৈরি। পূর্বদিকে রাস্তার পাশ থেকে একটা সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। মাঠজুড়ে বাঁশ পুঁতে পুঁতে মাইকের হর্ন লাগানো হচ্ছে। যতই মানুষ বাড়ছে, ততই হর্ন লাগানো হচ্ছে। মাইক যাঁরা লাগাচ্ছেন, তাঁরাও যেন হিমশিম খাচ্ছেন, কোনো কূলকিনারা পাচ্ছেন না। কত মানুষ হবে? মানুষ বাড়ছে আর তারা তার টানিয়ে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভলান্টিয়াররা খুবই তৎপর। মানুষের মাঝে প্রচণ্ড এক আকাঙ্ক্ষা, শোনার অপেক্ষা, কী কথা শুনাবেন নেতা। যাঁরা আসছেন, তাঁদের হাতে বাঁশের লাঠি, নৌকার বৈঠা ও লগি। তাঁদের মুখে-চোখে একই আকাঙ্ক্ষা – স্বাধীনতা। দীর্ঘ তেইশ বছরের শোষণ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এ মানুষগুলির মুখে-চোখে। এ ময়দানে শরিক হয়েছে সর্বস্তরের মানুষ – নারী, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-শিক্ষক, কিষান-কিষানি, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি, রিকশাওয়ালা, নৌকার মাঝি, শ্রমিক – কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ ঘরে নেই। ঢাকা শহরে এত মানুষ কোথা থেকে এলো? এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, বিস্ময়কর চিত্র।

এ যে আমাদের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের কথা। সকাল থেকে ট্রেনে-বাসে মানুষ আসছিল, এসেই যাচ্ছিল। গান গাইছিল,

শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি

আকাশে বাতাসে ওঠে রণি,

বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।

সংবাদপাঠক বিভূতি দাস আবেগদীপ্ত গলায় কী অপূর্ব ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন রেডিওতে। পরে তা বাজানো হয়েছিল কয়েকদিন। আমি শুনেছি বাড়িতে বসে।

'আমি বিভূতি দাস ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বলছি। বিরাট এই প্রান্তর, যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ আর মানুষ ...।' মিটিংয়ে মঞ্চে ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

কত মানুষ আর কত মানুষ! সেই মানুষের ভেতর আমিও ছিলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসামান্য বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা পেয়েছি, বড় রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি, এত রক্ত কোনো জাতি কোনো দেশে কোনো দিন দেয় নাই, যা আমার বাংলাদেশের মানুষ দিয়েছে। আমার লোকেরা, বৃদ্ধ থেকে বালক পর্যন্ত সকলেই সংগ্রাম করেছে, সেই সংগ্রাম কামিয়াব হতে পারত না যদি ভারতের জনসাধারণ এগিয়ে না আসত ...।' তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেবার মতো কিছু নাই, শুধু আমি এইটুকু দিতে পারি, নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি দেবার কিছু নাই, আছে শুধু ভালোবাসা দিলাম শুধু তাই।'

তিনি বলেছিলেন, 'আমরা ঘোষণা করেছি আমরা স্বাধীন, তুমি কোন জায়গার বাটপার হয়ে বললা, তুমি বলছ বাংলাদেশ তোমাদের অংশ, ভুলে যাও বন্ধু, সুখে থাকো বন্ধু, বাংলাদেশ স্বাধীন, বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে, তোমার ক্ষমতা নাই, বাংলার স্বাধীনতা হরণ করতে পার না ...। আপনারা আমার সঙ্গে স্লোগান দেন, জয় বাংলা, জয় বাংলা ...।' আমার মা রেডিওর ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন কতবার, যতবার তা বেজেছিল।

মনে পড়ে সেই ১৫ই আগস্টের কথা আমরা শুনলাম সন্ধ্যায়। তখন আমাদের দেশে জরুরি অবস্থা জারি। বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। তাঁকে হত্যা করেছে স্বাধীনতাবিরোধী একদল সামরিক কর্তা। শোকাহত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আবার দূরে সরে গেল আমাদের কপোতাক্ষ নদ, সাতক্ষীরা, ধূলিহর, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। আবার যোজন যোজন দূরে চলে গেল সাতক্ষীরা মহকুমার সামান্য এক গ্রাম ধূলিহর।

শেখ মুজিবুর রহমান জন্মেছিলেন গোপালগঞ্জ জেলায়। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। বছর সাত-আট আগে আন্তরজাল যখন আমার কাছে পৌঁছল এমন কয়েকজন বাংলাদেশের বন্ধু হলো, যাঁদের আদিবাড়ি ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমায়। হ্যাঁ, গোপালগঞ্জ এখন জেলা। অবিভক্ত ফরিদপুর অনেক সুসন্তানের জন্ম দিয়েছে জানি। লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন, সকলেই ফরিদপুরের সন্তান। পাহাড়ের মতো মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মেছিলেন ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে টুঙ্গিপাড়ায়। আমার বন্ধু কুলদা রায়, রুকসানা কাজল, কচি রেজার বাড়ি গোপালগঞ্জে। তাঁরা বললেন, তাঁদের কারো বাসা গোপালগঞ্জ শহরের উদয়ন রোডে, কারো বাড়ি কালীবাড়ি থিয়েটার রোডে। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের শহরের বাসা কোর্ট মসজিদের পাশে। কুলদা রায় গোপালগঞ্জের মানুষ, লেখেন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কথা এইভাবে ...

একদিন ঠাকুরদা রওনা হলেন ঢাকায়। অনেক বয়েস হয়েছে। এটাই তার শেষ তীর্থযাত্রা। ধুতি পাঞ্জাবী ধোপা বাড়ি থেকে ধুইয়ে আনা হল। সঙ্গে গেল বাউল। তার বাউলা ড্রেস। বলে, আমি আউলা মানুষ। নামাজও পড়ি। আবার গানও গাই। আমার তো কোনো জাত ফাত নেই। বিনোদ সাহ যেতে পারলেন না। দিন দুনিয়ায় তাঁর কেউ নেই। যাঁরা ছিল তাঁরা একাত্তুরে শহীদ। এখন কেবল একটি রামছাগল তার সঙ্গী। তিনি ঢাকায় গেলে রামছাগলকে কে দেখবে? চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিনোদ সাহ বললেন, 'শেখরে কৈয়েন ছোটোবাবু, তোমার জন্য বুক টান কৈরা হাঁটতে পারছি। তোমার মুখের দিকেই চাইয়া বাঁইচা আছি। তোমারে সালাম।'

আর গেলেন কাশেম কবিরাজ। কবিতা লেখেন। আর তসবি টেপেন।

একসময় নাটকও করতেন। জলিরপাড় থেকে উঠবেন টমাস তিমথি সরকার।

বাবার মন খুব খুশি। এবার আমাদের কপাল ফিরতে পারে। মা দুদিন পায়েস রান্না করে ঠাকুরের ভোগ দিলেন।

ঠাকুরদা ফিরলেন দিনচারেক পরে। খুব সুখী। বাবাকে বললেন, কিছু কি চাইতে গেছি নিকিরে! তিনি তো মানুষ নন। তিনি আমাগো চোখের জল মুছায় দিছেন। নিজের মাটিকে নিজের করে দিয়েছেন। নিজের ঘরকে নিজের করে দিয়েছেন। তার কাছে কি আর কিছু চাওয়ার থাকেরে পাগলা! তিনি বুকে টেনে নিয়েছেন। বলেছেন, কোনো ভয় নেই। আমি আছি। আমার প্রাণ ভরে গেছে।

এর কিছুদিন পরে ঠাকুরদা মারা গেলেন। তাঁর কোনো দুঃখ ছিল না। তিনি গেলেন পূর্ণতার লাবণ্য নিয়ে।

একদিন ভোরবেলায় বাবা কাজে গেলেন না। বাবা পুরনো রেডিওটাকে চড়-থাপ্পড় দিচ্ছেন। কড় কড় শব্দ করে একদম থেমে গেল।

বাবা ধাই ধাই করে ছুটে গেলেন হারুন চাচার বাড়িতে। হারুন চাচা রেডিও শুনছিলেন। চোখে জল।রেডিও বন্ধ করে দিলেন। বললেন, বাড়ি ফিরে যাও। দ্যাখো বাঁচতে পারো কিনা। বাংলাদেশে আবার দোজখ নেমে আসছে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখলাম, আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবু মিয়া আর ছোটকা দাস ধানি মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছেন। কমরেড শওকত চৌধুরী তাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন। বললেন, পালিয়ে যাচ্ছেন কেন? আসেন রুখে দাঁড়াই।

সাবু মিয়া ফ্যাস ফ্যাস করে জবাব দিলেন, সম্ভব নয়। অস্ত্রপাতি নাই। জমা দিয়া ফেলাইছি।

– জনগণকে নিয়ে নেমে পড়ি। অস্ত্রের কি দরকার?

– ওদের হাতে অনেক অস্ত্র, অনেক টাকা-পয়সা আর।

এরপর কি বললেন বোঝা গেল না। ঘোড়া জামাল কমরেড শওকত চৌধুরীকে ধাক্কা মেরে ছুটে বেরিয়ে গেলেন অনেক দূরে। তার ঘোড়াটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার পিঠে কোনো সওয়ার নেই। যে-কেউই উঠে পড়তে পারে এখন।

অনেকদিন পরে এদিন পনু মিয়াকে দেখলাম। সঙ্গে জি রহমান। আগের চেয়ে গায়ের রং আরো উজ্জ্বল হয়েছে। স্বাস্থ্যে ভরপুর। সম্প্রতি আরেকটি বিয়েও করেছেন। আমাদের বাসায় এলেন। যে ঘরটিতে ঠাকুর্দা থাকতেন তার দরোজা লাথি মেরে খুলে ফেললেন। বাবাকে ঠান্ডা গলায় বললেন, এটা খালি করে দাও।

এ ঘরটি সাড়ে তিন বছর আগে তার দখলে ছিল। অফিস ছিল রাজাকার কমিটির। আজ আবার ঘরটি তাদের দখলে চলে গেল।

সুরুদ্দিন মাস্টার অনেকদিন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানায় পড়েছিলেন। তার চোখে আজ সুরমা টানা।পরনে আচকান। পায়ে মোকাসিন। মাথায় জিন্নাহ টুপি। জি রহমানের সঙ্গে বুক মেলালেন।তার অসুখ সেরে গেছে। তার বড় মেয়েটি শেখা আপা দীর্ঘদিন পরে অন্দরে ঢুকলেন নিরিবিলি ঘুমাতে।আর সে ঘর থেকে শুকনো মুখে কিছু খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বাবরি চুলের যুবক বাইরে এসে দাঁড়াল। তারা এখন কী করবে বুঝতে পারছে না। পনু মিয়াকে দেখে বড় করে সালাম ঠুকল। পনু মিয়া তাদের মাথা থেকে লাল ফেট্টি খুলে দিলেন। পিঠ চাপড়ে বললেন, গুড জব। তোমরা অনেক করেছো।

ওরা সবাই ছিল ক্ষুধার্ত। বিনোদ সা'র রামছাগলটিকে প্রকাশ্য রাস্তায় জবাই করল। বিনোদ সা নদীর দিকে ছুটে গেলেন। তারপর শুরু হলো রান্না। অনেকগুলো লোক সেদিনই অন্ধকার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, মাঝে মাঝে হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে।উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণে। অই গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া।

অনেকদিন পরে এইসব লোকজনের চমৎকার একটি ভোজ হলো। চারিদিকে পাকিস্তানি মশলা আর বাংলার ঝলসানো গোস্তের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে – একটি রাস্তা থেকে অনেকগুলো রাস্তায়।বাড়িঘরে।অফিস আর স্কুলে। পুলিশ ব্যারাকে। ধর্মশালায়। আদালতে। নদীতে।ধানক্ষেতে। গাছে গাছে। আকাশে। কবরে। মগজে।

এই সব কথা অনেকটাই আবেগের। কিন্তু আমি তা সত্য জানি। সেই ১৫ই আগস্ট আর তার পরের অনেকদিন ছিল চোখের জলের। তিনি শুধু বাংলাদেশের মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেননি, আমার মায়ের চোখের জলও মুছিয়ে দিয়েছিলেন, আমার বাবার মনে এনেছিলেন আনন্দ। প্রণাম তাঁকে। আমার লেখায় ক্রমাগত বাংলাদেশ এসে যায়। এসেই যায়। সাতক্ষীরা, ধূলিহর, কপোতাক্ষকে আমি আমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেব বলেছিলাম। ফিরিয়ে দিতে চাইছি সেই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি থেকে।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমার পিতৃপুরুষ। পিতৃপুরুষের তর্পণ হলো তাঁরই ডাকে, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম ...। হ্যাঁ, জানি মানুষের সংগ্রাম ফুরোয় না। সংগ্রামের শেষ নেই। শেখ মুজিবের জীবন থেকে সেই শিক্ষাই পেয়েছি আমরা।

Tags

অমর মিত্র

Share

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

বাড়ি ৪২ , রোড ২৭ , ধানমন্ডি
শেখ কামাল সরনি , ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮০ ২ ৪১০২০৮২৩, ০২ ৪১০২০৮২৪, ০৯৬১৩ ০২০৮২৫

প্রকাশক: আবুল খায়ের
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সম্পাদক: সুব্রত বড়ুয়া
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য: রুবী রহমান, লুভা নাহিদ চৌধুরী
© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত